পাহাড়ে/আষাঢ়ে

ভবানীপ্রসাদ ঘোষ

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

- ইন্দ্রতাল ৯
- রক্তপান্ত ২২
- দাড়ি..... ৩২
- সজারু..... ৪৪
- বৃষোৎসর্গ..... ৬১
- গান..... ৭১
- বহু যুগের ওপার হতে..... ৮৫
- ভিক্ষু ১০৪
- হাঁচি ১১৩
- বিদেহী আততায়ী ১২৫
- ন্যাজ নাড়ছে কেন ১৪৫
- জিলিপি..... ১৫১

ইন্দ্রতাল

চমৎকার। ধ্বস নেমে পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাহলে কি ফিরে যেতে হবে? কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন?

চারজনের দল - বিশ্বজিত, প্রাণেশ, রঞ্জিত আর আমেদ — ট্রেকিং'-এ বেরিয়েছিল লাহল-স্পিতি উপত্যাকায়। গড় উচ্চতা বারো হাজার ফিট, হাজারটা পয়েন্ট আছে ষোলো হাজারের। ট্রেকারদের স্বর্গ। আর হিমালয়ের এই অঞ্চলটা এখনো সভ্যতার হাতে বিধ্বস্ত হয়নি।

কিন্তু বিধি বাম। বিশ্বদের গন্তব্য ছিল মহেশ টিব্বা। গ্রামফু পর্যন্ত বাস, তারপর চার দিনের ট্রেকিং। মহেশটিব্বার উচ্চতা পনেরো হাজার, শেষ জনপদ (একটা তিরিশ ঘরের ছোট্ট গ্রাম, নাম থাংপু) ন'হাজার ফিটে। তারপর রাত কাটাতে গেলে তাঁবু ফেলতে হয়।

অক্টোবরের শেষ, এখন ফুলের মরসুম নয়। আদিগন্ত ধূসর শিলাস্তূপের ঢেউ, মাঝে মধ্যেই বরফে ঢাকা গিরিশৃঙ্গ চোখে পড়ে - কিন্নর কৈলাশ, শেশর রুংগ, শ্রীখন্ড, কৈলাশ - আরো কত। এই রজত শুভ্র শিখরদের সৌন্দর্যতো আছেই, কিন্তু সৌন্দর্যের চেয়ে বড় তাদের মহিমা। যুগযুগান্ত অপেক্ষা করে আছে অনন্তের বাণী, অনন্তের ইঙ্গিত নিয়ে।

এখন এ-অঞ্চলে ঠান্ডার সময় বটে, কিন্তু মাঝে মাধ্যে কখন কোথায় আবহাওয়া বদলে যাবে, হঠাৎ মেঘ করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামবে অথবা হঠাৎ তুষারপাত শুরু হবে কেউ বলতে পারে না। আর বিশ্বরা যখন তেরো হাজার ফুট ছাড়িয়েছে তখন এক বিদেশী দলের সঙ্গে দেখা। তারাই বলল বৃষ্টিতে রাস্তা ধ্বসে গেছে। খাদের পাশে চলার উপযোগী দেড় ফুট রাস্তা — তাও যদি ধ্বসে যায় তাহলে এগোবার চেষ্টা করা মুর্খামি।

সুতরাং নিচের থাংপু গ্রামে ফিরে আসতেই হল। কিন্তু হাতে এখনো পাঁচটা দিন আছে। কলকাতায় ফেরা হবে, না, অন্য কোনো ট্রেকিং পয়েন্ট খোঁজা হবে। দুপুরের নরম রোদে যখন ওরা ওম নিচ্ছে তখন গ্রামেরই একজন, সরযূপ্রসাদ, প্রস্তাব দিল, "সাব, আপনারা কোথাও যাবেন বলছিলেন।"

—"কেন? তুমি কোনো রাস্তা বাতলাতে পারো?"

—"হাঁ সাব। এই গাঁয়েরই একটা দল কাল ইন্দ্রতাল যাবে। আপনারা সরপঞ্চের সঙ্গে কথা বলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।"

কিন্তু বিশ্বদের পোর্টার-গাইড নীলম হাঁ হাঁ করে উঠল - "ইন্দ্রতাল! কভি নেহি। মত যানা বাবুজি।"

—"কেন? রাস্তা খুব খারাপ?" বিশ্ব জিজ্ঞেস করল।

সরযূ হেসে বললে, "রাস্তা এমন কিছু খারাপ নয়। আমাদের সঙ্গে দুজন অওরত যাবে, একটা বাচ্ছাও।

"যাক তারা", নীলম গর্জে উঠল, "বাবুরা যাবে না"।

বাবুরা যাবে না। কেন যাবে না? যেতে বাধা কি? ইন্দ্রতাল ছোট্ট একটা লেক। পার্বতীর শাপগ্রস্ত ইন্দ্র তপস্যার পর এই সরোবরের জলে স্নান করে শুচি হয়েছিলেন - তাই এর নাম ইন্দ্রতাল। সুতরাং এই সরোবরের জলে স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে মনোস্কামনা পূর্ণ হয়। যারা যাবে তাদের সবারই একটা না একটা মানত আছে। তাই তারা যাবে আগামী প্রতিপদে লেকের জলে স্নান করে পূজো দিতে।

এটা তো হ'ল জনশ্রুতি। সব তালেরই একটা মাহাত্ম্য থাকে। জ্ঞাতব্য যা জানা গেল তা হল ইন্দ্রতালের উচ্চতা মাত্রই তেরো হাজার ফিট। লেকে দুতিনটে রাস্তা দিয়ে পৌঁছান' যায়। তার মধ্যে পশ্চিমের রাস্তাটাই বেশী ব্যবহৃত। পূব দিক থেকে, অর্থাৎ সরযূপ্রসাদরা যে রাস্তায় যাবে, তাতে সাধারণত তিনদিন লাগে। রাস্তাটার দু'তিনটে জায়গা বিপজ্জনক বলা যায়, তা বলে লোকে কি আর যাচ্ছে না। তবে.....

এরা চারজন তেড়ে উঠে বললে, "তবে? তবেটা কি?"

নীলম বললে, "বাবু, এ রাস্তায় এত বরফ পড়ে আর হাওয়া বয় যে আপনারা পারবেন না।"

প্রাণেশ চোখ পাকিয়ে বললে, "কি বকছ হে! আমাদের মুক্তিনাথ ঘোরা আছে। মুক্তিনাথ কোথায় জান?"

রঞ্জিত বললে, "মুক্তিনাথ হোক আর মহাগুনাস হোক তোমাদের সঙ্গে মেয়েছেলে যাচ্ছে তো! তা মেয়েছেলেরা যেতে পারবে আর আমরা পারব না?"

সরযূ চুপচাপ একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছিল। নীলম কিছু একটা বলব বলব করেও চুপ করে গেল।

বিশ্ব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে, "আমরা যাব।"

তখন নীলম বললে "তব শুনিয়ে সাব, এ রাস্তায় দানো আছে।"

হৈ চৈ পড়ে গেল। আমেদ খ্যাঁক করে উঠল। "দানো আছে? কি করে দানো? মানুষ ধরে ধরে খায়? আমাদের খাবে?"

সরযূপ্রসাদ এদের ঠান্ডা করতে নীলমকে বললে, "কেন ভয় দেখাচ্ছ বাবুদের? বাবুজী, দানোটানো কিছু না। তবে দু'একবার কিছু হয়েছে যা আমরা পাহাড়ীরা বুঝতে পারিনি। লামারা বলে এ রাস্তায় ইয়েতিরা যাতায়াত করে। নীলম হয়তো তাকেই দানো বলছে। তবে ইয়েতি হোক দানো হোক কেউ কখনো তাদের দেখে নি।"

"ইয়েতি না হলে দুটো লোক দুবারে মরল কেমন করে?" নীলম পাল্টা চ্যালেঞ্জ করলো।

"তারা যে ভয় পেয়ে পড়ে গিয়ে মরেনি তারই বা ঠিক কি? একটা দেহ তো তোলা হয়েছিল খাদ থেকে। তাকে তো কেউ গলা টিপে মারেনি।"

"ধরো তোমরা যাচ্ছ, যদি ইয়েতি আসে?"

"তিন চার পুরুষ ধরেই তো যাচ্ছি ওপথে। আমরা যাব, ইয়েতিরা যায় যাবে।"

বিশ্ব তর্ক গড়াতে দিল না। জানিয়ে দিল তারা যাচ্ছে।

পাহাড়ীরা বুঝতেই পারবে না অ্যাডভেঞ্চার - প্রিয় চার বাঙালী তরুণের কাছে 'ইয়েতি' শব্দটা কি রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। সলোমনের গুপ্তধনও এত আর্কষক নয়।

নীলম শুকনো মুখে চারজনের যাওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিলো। তবু বিড়বিড় করেই চলল, "ওরা এখানকার লোকদের কিছু বলেনা....."

"আমাদেরও কিছু বলবে না," প্রাণেশ হাঁক পাড়লে, "আসল ফরেনার হচ্ছ তুমি। তা তুমি চাইলে ফিরে যেতে পারো। ভয় নিয়ে পথ হাঁটলে বিপদ হতে পারে।"

ইঙ্গিতটায় নীলমের ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল। বলল, "আমি ডরপোক নই, আপনাদের জন্য বলছিলাম।"

গ্রামের সর্দার ভিরিন্দর সিংকে অবশ্য রাজী করাতে বেগ পেতে হয়নি। সুতরাং পরের দিন ইন্দ্রতাল যাত্রা।

বিশ্বদের চারজনের হবি হ'ল ট্রেকিং। চারজনের সবাই হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর গোড়ায়। উপরন্তু বিশ্ব, প্রাণেশ এবং আমেদ - এরা

তিনজন হিমালয় মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমাধারী। রঞ্জিতের সে ছাপ নেই বটে কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই সে পাহাড়ে পর্বতে রপ্ত।

সে রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া সেরে চারজনেই বাইরে বসেছিল। স্তব্ধ শান্ত চারদিক, মাথার উপরে আকাশ, তারাগুলো হাতে করে পেড়ে আনা যায়। আমেদের গানের গলা ভাল। কোনো যাত্রা শুরু করার আগে ও ওই গানটা গাইবেই— পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে....। রঞ্জিত মাউথ অর্গানে তার সহযোগী। গ্রামের ছেলেমেয়েদের খুব ভাল লেগে গেল। তাদের দাবী, বলা বাহুল্য, হিন্দি গান — গাইতেই হয়।

সূর্য ওঠার আগেই যে দলটা তৈরী হল তার সদস্য আট জন, প্লাস বিশ্বদের পাঁচজন নীলমকে নিয়ে। দলনেতা ভিরিন্দর সিং পুরোহিত লাখন, সরযূপ্রসাদ তো আছেই, আরো চারজন পুরুষ সদস্য এবং লীলাবতী বলে একটি মেয়ে (দ্বিতীয় মহিলাটি আসেন নি)। লীলাবতীর বয়স তেইশ - চব্বিশ হবে, তার কোলে বছর দেড়েকের একটি শিশু। তাকে কাপড়ের পোঁটলা থেকে আলাদা করার একমাত্র উপায় হ'ল তার মুখটা চোখে পড়া - একটা মস্ত আপেলের গায়ে দুটো ছোটো ছোটো চোখ, টুকটুকে ঠোঁট আর সর্দি ভরা নাক। লীলাবতীর স্বামী কানপুরে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে আছে, তার ফিরে আসার মানত করতে লীলাবতীর যাওয়া। সবশেষে বুকপর্যন্ত কাঁচাপাকা দাড়ি, আলখাল্লা পরা এক শীর্ণ দীর্ঘদেহী প্রৌঢ়। এরা তাঁকে ডাকে ফকিরবাবা বলে। আমেদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে আমেদ ডানহাতটা দুবার মাথায় ঠেকাল। ফকিরবাবা মৃদু হেসে তসবীজের মালা জড়ানো হাতটা তুললেন।

যাত্রা শুরু হ'ল যখন তখনো আকাশে চাঁদ মিলিয়ে যায়নি। শান দেওয়া ছুরির মত হাওয়া ছিল আর কনকনে ঠান্ডা। সবার আগে ভিরিন্দর, লীলাবতী দলের মাঝামাঝি। লীলাবতীর বাচ্চা সারা রাস্তা পিঠ বদল করতে করতে চলল। শেষের দিকে বিশ্বরা চারজন, আর সবশেষে সরযূপ্রসাদ।

প্রথম দিন ভালই পথ চলা গেল, আঠারো কিলোমিটার তো বটেই। লীলাবতী মেয়ে হলেও সমান তালে পাল্লা দিতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। সন্ধ্যার দিকে যেখানে থামল ওরা সেখানে একটা ওভারহ্যাং বা পাথরের খিলেন আছে। তিন পাশ খোলা হলেও রান্নাবান্না ঘুম বেশ স্বচ্ছন্দে হয়ে গেল।

পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই যাত্রা শুরু। আজ একটা খাড়া চড়াই পড়বে। সেটা উঠলে ব্রহ্মা পাস। পাস মানে একটা উচু পয়েন্ট, যেখান থেকে চারদিকেই

যাওয়া যায়। যেমন রোটাং পাস। তবে ব্রহ্মা পাসে নাকি প্রচন্ড হাওয়া বয়। হাওয়ার বেগ কখনো কখনো ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

ব্রহ্মা পাসের আগে একটা হাড়ভাঙা চড়াই। আর এই চড়াই জুড়ে গভীর বন। বনে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল বাইরের পৃথিবীটা মুছে গেছে। এমনিতে ঘন গাছপালা, সূর্যর আলো এত কম ঢোকে যে শ্যাওলা মস দাড়ির মত গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। তারপর আকাশে এখন ঘন কালো মেঘ। একটু পরেই হয় বৃষ্টি নামবে নয়তো বরফ পড়তে শুরু করবে।

চড়াই'এর মাঝপথে একটু দম নিতে থামতেই হল। লীলাবতীও হাঁপাচ্ছে, তার ছেলে অবশ্য বিন্দুমাত্র ক্লান্ত নয়, ঘুমিয়েই কাদা। রঞ্জিত কথাটা তুলল নিজেদের মধ্যে — "কেউ কি আমাদের ফলো করছে?"

বিশ্ব বললে, "আমার তো মনে হয়নি।"

প্রাণেশ কথা না বলে ক্যামেরা রেডী করছিল। বলা যেতে পারে ওই দলের ফোটোগ্রাফার। গলায় দুটো ক্যামেরা ঝোলেই। আমেদ টিপ্পনি কেটে তাকে জিজ্ঞাস করলে, "ইয়েতির ছবি তুলবি বুঝি? কোন পোজে?"

প্রাণেশ মুখ না তুলেই বললে, "তোকে কোলে নিয়ে আছে এরকম হ'লে ভাল হয়।"

খানিক পরে বন পাতলা হয়ে এল। কিন্তু এত বরফ পড়ছে যে বেশী দূর দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তা ঢাকা পড়ে গেছে বরফে। সামনে দুজন লাঠি ঠুকে ঠুকে বরফ সরিয়ে রাস্তার হদিশ রাখছে। চড়াই এখনো কিছুটা বাকি, অন্ততঃ আরো আধঘন্টা। হাওয়ার গতিবেগ ক্রমশই বাড়ছে। শোঁ শোঁ করে বইছে ঠান্ডা বাতাস।

হঠাৎ হাওয়ার আওয়াজ ছাপিয়ে এক মর্মভেদী চিৎকার সবাইকে থমকে দাঁড় করিয়ে দিলে। এ চিৎকার জন্তুর না মানুষের? শুধু একটানা চিৎকার নয় কাটা কাটা যেন কয়েকটা কথা একই সুরে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, থামছে, তারপর আবার শুরু হচ্ছে।

পাহাড়ীদের সমস্ত দলটা যেন নেকড়ের তাড়া খাওয়া ছাগলের দলের মত পিঠে পিঠ দিয়ে এক জায়গায় হয়ে গেল। বিশ্বরা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক দেখছে। শুধু ফকিরবাবা এক পাশে লাঠি হাতে নির্বিকার দাঁড়িয়ে।

কয়েক সেকেন্ড বাদে আবার সেই অপার্থিব চিৎকার। তুষারের ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে সেই চিৎকার পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে।